ব্রেন কমপিউটার ইন্টারফেস এবং ব্রেন হ্যাকিং

গোলাপ মুনীর

ব্রেন কমপিউটার ইন্টারফেস। সংক্ষেপে বিসিআই। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি জগতের গুরুত্বপূর্ণ এক প্রযুক্তি। এই বিসিআই প্রযুক্তি আরো নানা নামে পরিচিত। কেউ বলেন মাইন্ড মেশিন ইন্টারফেস (এমএমআই), কেউ বলেন ডাইরেক্ট নিউরাল ইন্টারফেস (ডিএনআই) কিংবা ব্রেন মেশিন ইন্টারফেস (বিএমআই)। যে নামেই ডাকি, এই বিসিআই প্রযুক্তি হচ্ছে এমন এক প্রযুক্তি, যা সরাসরি সংযোগ গড়ে তোলে মানবমস্তিষ্ক ও একটি বাহ্যিক যন্ত্রের মধ্যে। এটি মানবমস্তিষ্ক ও যন্ত্রের মধ্যে সরাসরি সংযোগ গড়ে তোলার একটি উপায়।

ব্রেন কমপিউটার ইন্টারফেস। সংক্ষেপে বিসিআই। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি জগতের গুরুত্বপূর্ণ এক প্রযুক্তি। এই বিসিআই প্রযুক্তি আরো নানা নামে পরিচিত। কেউ বলেন মাইন্ড মেশিন ইন্টারফেস (এমএমআই), কেউ বলেন ডাইরেক্ট নিউরাল ইন্টারফেস (ডিএনআই) কিংবা ব্রেন মেশিন ইন্টারফেস (বিএমআই)। যে নামেই ডাকি, এই বিসিআই প্রযুক্তি হচ্ছে এমন এক প্রযুক্তি, যা সরাসরি সংযোগ গড়ে তোলে মানবমস্তিষ্ক ও একটি বাহ্যিক যন্ত্রের মধ্যে। এটি মানবমস্তিষ্ক ও যন্ত্রের মধ্যে সরাসরি সংযোগ গড়ে তোলার একটি উপায়। Brain-Computer Interface (BCI) technologies connect the human brain to devices. It is a direct communication pathway between the brain and an enternal device.

মানুষের ধারণা ও উপলব্ধি করার কাজটিকে চিকিৎসাবিদ্যার ভাষায় cognitive অথবা sensory-motor function বলা হয়। এই ধারণা ও উপলব্ধি ক্ষমতা আমরা কখনো কখনো হারিয়ে ফেলি, কখনো এই ক্ষমতা আমাদের কমে যায়। এই ক্ষমতা ফিরিয়ে আনা কিংবা এই ক্ষমতা কমে গেলে তা বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে এই বিসিআই প্রযুক্তি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

বিসিআই নিয়ে গবেষণার শুরু ১৯৭০-এর দশকে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলেসে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশনের অর্থ সহায়তায় এবং তারও পরে সে দেশের ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস অ্যাজেন্সির (ডিএআরপিএ) সাথে চুক্তির মাধ্যমে এ গবেষণা চালু হয়। এ গবেষণা শেষে গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশের পর বিসিআই প্রযুক্তি বিষয়টি প্রথমবারের মতো সায়েন্টিফিক লিটারেচারে স্থান পায়।

সেই থেকে বিসিআই প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়ন (আরঅ্যান্ডডি) কর্মকাণ্ড মূলত কেন্দ্রীভূত ছিল নিউরোপ্রসথেটিক অ্যাপ্লিকেশনে, যার লক্ষ্য ছিল মানুষের হারানো শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, ধারণাশক্তি, উপলব্ধিশক্তি ও চলার শক্তি ফিরিয়ে আনা। সেই সূত্রে আমরা পেয়েছি মস্তিষ্কের কর্টিক্যাল প্লাস্টিসিটি। এর মাধ্যমে মস্তিষ্কে সংযোজিত প্রসথেসিসকে অ্যাডাপ্টেশনের পর মানব মস্তিষ্কের মতো ন্যাচারাল সেন্সর অথবা ইফেক্টর সেন্সরের মাধ্যমে পরিচালনা করা যায়। এরপর ১৯৯০-এর দশকে এসে পশুর ওপর পরীক্ষা চালনার পর প্রথমবারের মতো মানবদেহে নিউরোপ্রসথেটিক ডিভাইস সংযোজন সম্ভব হয়।

সবশেষে আসে যুদ্ধক্ষেত্রে এর ব্যবহারের বিষয়টি। সময়ের সাথে মানুষের যুদ্ধক্ষেত্রেরও সম্প্রসারণ ঘটে চলেছে। প্রথম যুদ্ধক্ষেত্র ছিল স্থল যুদ্ধক্ষেত্র (Land), এরপর সমুদ্র যুদ্ধক্ষেত্র (sea), এরপর হলো বিমান যুদ্ধক্ষেত্র (air), তারপর মহাকাশ যুদ্ধক্ষেত্র (space)। তারও পর যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে আমরা পেলাম সাইবারওয়ার (cyberspace)। কিন্তু আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে মানবজাতি আজ অবতীর্ণ ষষ্ঠ ওয়ারফেয়ার ডোমেইন বা যুদ্ধক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্রটি হচ্ছে : মানব মস্তিষ্ক বা হিউম্যান ব্রেন। যারা তথ্য পেতে আগ্রহী তাদের মন-মানসে প্রভাব সৃষ্টি করাই শুধু এই ষষ্ঠ যুদ্ধক্ষেত্রের কাজ নয়। বরং এই যুদ্ধ হচ্ছে বাইরের কোনো যন্ত্রের সাথে মানুষের মগজের সংযোগ ঘটিয়ে সে মানুষকে তথা শত্রুকে নিজেদের ইচ্ছার কাছে সমর্পিত করে যা ইচ্ছে তাই করিয়ে নেয়া। সোজা কথায় এটি হচ্ছে clausewitz-এর যুদ্ধের সংজ্ঞারই বাস্তবায়ন করা। তার সেই যুদ্ধের সংজ্ঞা হচ্ছে : Complying an adversary to submit one's will– কোনো শত্রুকে নিজের ইচ্ছের কাছে সমর্পিত হতে বাধ্য করা। সোজা কথা শত্রুজনের ব্রেন হ্যাকিং করে তাকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো যা ইচ্ছে করিয়ে নেয়া। এ ক্ষেত্রে বিসিআই প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হবে এর অনৈতিক অপপ্রয়োগ, মানবেতিহাসের জঘন্যতম অপরাধ। যুক্তরাষ্ট্র এই বিসিআই প্রযুক্তিকে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের ওপর যেসব গবেষণা চালাচ্ছে, তাতে এই অপপ্রয়োগের সম্ভাবনার আশঙ্কা রয়েছে। সামরিক ক্ষেত্রে এ প্রযুক্তি সফল ও নির্দোষ ব্যবহার হতে পারে আঘাতের পর কিংবা অবশ হয়ে পড়া সৈন্যদের সক্রিয় করে তোলার কাজে।

ইতিহাস বলে

হ্যান্স বার্গার যখন মানব মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কর্মকাণ্ড আবিষ্কার ও ইলেকট্রোএনসেফেলোগ্রাফি (ইইজি) উদ্ভাবন করেন, তখনই শুরু হয় বিসিআই প্রযুক্তির ইতিহাস। হ্যান্স বার্গার ১৯২৪ সালে সর্বপ্রথম ইইজি'র মাধ্যমে মানব মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড রেকর্ড করতে সক্ষম হল। ইইজি'র পথচিহ্নগুলো বিশ্লেষণ করে বার্গার মস্তিষ্কের ওসিলেটরি অ্যাকটিভিটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হন। যেমন আলফা ওয়েভ (৮-১২ হার্টজ)। আলফা ওয়েভের আরেক নাম বার্গার'স ওয়েভ।

বার্গারের প্রথম রেকর্ডিং যন্ত্র ছিল খুবই আদিম ধরনের। তিনি তার রোগীদের মাথার খুলির নিচে সিলভারের তার ঢুকিয়ে দেন। পরে এগুলো প্রতিস্থাপন করা হয় সিলভার ফয়েলের মাধ্যমে। এ ফয়েলগুলো রোগীদের মাথায় জুড়ে দেন রাবার ব্যান্ড দিয়ে। বার্গার এসব সেন্সর সংযুক্ত করেন একটি লিপম্যান ক্যাপিলারি ইলেকট্রোমিটারের সাথে, যাতে প্রদর্শিত হয় ইলেকট্রিক ভোল্টেজ। এই ভোল্টেজ এতই ছোট যে, তা ১০০০ ভোল্টের এক-দশমাংশের মতো। বার্গার দেখলেন, মস্তিষ্কের রোগের সাথে সাথে ইইজি ওয়েভ ডায়াগ্রামেরও পরিবর্তন হয়। ইইজি মানব মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করে।

বিসিআই যেভাবে কাজ করে

আধুনিক কমপিউটারের শক্তিমত্তা সময়ের সাথে বেড়ে চলেছে। পাশাপাশি মানব মস্তিষ্ক সম্পর্কেও আমাদের জানার পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর ফলে আমরা অবাক করা সব ▸

বৈজ্ঞানিক কল্পকথাকে বাস্তবের কাছাকাছি এনে দাঁড় করাতে সক্ষম হচ্ছি। কোনো মানুষের মস্তিষ্কে সরাসরি সিগন্যাল সঞ্চালনের কথা ভাবুন তো। এর মাধ্যমে আমরা দেখতে, শুনতে অথবা অনুভূব করতে পারব সুনির্দিষ্ট কিছু সেন্সরি ইনপুট। এভাবে দূর থেকে যন্ত্র দিয়ে অন্যের মগজে সিগন্যাল পাঠিয়ে তার ভাবনা-চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। মারাত্মকভাবে পঙ্গু ব্যক্তির জন্য ব্রেন কমপিউটার ইন্টারফেস (বিসিআই) প্রযুক্তি হচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাযুক্তিক অগ্রসর। আগামী কয়েক দশকের মধ্যে আমরা বিসিআই প্রযুক্তির নানা অবাক করা সব প্রয়োগ দেখতে পারব। আমরা এখানে প্রয়াস পাব বিসিআই প্রযুক্তি সম্পর্কে কিছু জানার– এটি কিভাবে কাজ করে, এই প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা কী, বিসিআই প্রযুক্তির ভবিষ্যতইবা কী?

ইলেকট্রিক ব্রেন : আমাদের মগজ কাজ করে কিছু সুনির্দিষ্ট উপায়ে। বিসিআই প্রযুক্তি কাজ করে মগজের এসব ফাংশনের ওপর নির্ভর করে। আমাদের মগজ বা মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ নিউরন দিয়ে। মস্তিষ্কের আলাদা আলাদা নার্ভ-সেল বা স্নায়ুকোষগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত ডেনডাইটিজ ও এক্সন দিয়ে। যতবার আমরা ভাবি, চলাচল করি, অনুভব করি কিংবা কিছু স্মরণ করি, তখন আমাদের নিউরনগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে। আর এই কাজ পরিচালিত হয় ছোট ছোট ইলেকট্রিক সিগন্যাল দিয়ে। এই সিগন্যাল এক নিউরন থেকে আরেক নিউরনে যায় প্রতি ঘণ্টায় ২৫০ মাইলের মতো বেগে। প্রতিটি নিউরনের আবরণে থাকা আয়নের ইলেকট্রিক পটেনশিয়ালে পার্থক্য সৃষ্টি করে এসব সিগন্যাল সৃষ্টি করা হয়। যদিও যেসব পথে এসব সিগন্যাল চলে, তা myelin নামের কিছু একটা দিয়ে ইনসুলেটেড করা থাকে, তবু কিছু কিছু ইলেকট্রিক সিগন্যাল পালিয়ে বা হারিয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীরা এসব সিগন্যাল চিহ্নিত করতে পারেন। আর তারা তা সরাসরি কোনো ধরনের যন্ত্রে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এটি অন্যভাবেও কাজ করতে পারে।

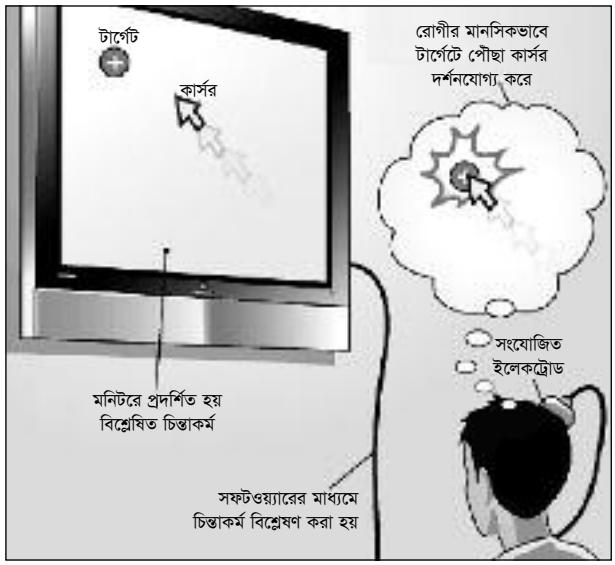

যেভাবে কাজ করে ব্রেন কমপিউটার ইন্টারফেস

যেমন যখন কেউ লাল রং দেখেন, তখন তার অপটিক নার্ভ দিয়ে কোন ধরনের সিগন্যাল মস্তিষ্কে পাঠানো হয়, বিজ্ঞানীরা তা ধরতে পারেন। এরা এমন একটি ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারেন, যা দিয়ে ঠিক একই সিগন্যাল কারো মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়া যায়, যখন ক্যামেরাটি লাল রং দেখতে পারে। এর ফলে অন্ধ মানুষের চোখ না থাকলেও তা দেখতে পারে।

বিসিআই ইনপুট ও আউটপুট : আজকের দিনে যেসব গবেষকেরা ব্রেন কমপিউটার ইন্টারফেস নিয়ে কাজ করছেন, তাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইন্টারফেসের বেসিক মেকানিকস। সবচেয়ে সহজ ও কম আক্রমণমূলক পদ্ধতি হচ্ছে একগুচ্ছ ইলেকট্রোড, যা আসলে একটি ইলেকট্রোএনসেফেলোগ্রাফ (ইইজি) যন্ত্র। আর এই যন্ত্রটি সংযুক্ত থাকে মাথার খুলির সাথে। এই ইলেকট্রোডগুলো ব্রেন সিগন্যাল ধরতে পারে। তা সত্ত্বেও মাথার খুলি ব্লক করে দেয় বা আটকে দেয় বেশ কিছু ইলেকট্রিক সিগন্যাল এবং এসব সিগন্যালকে এলোমেলো করে ফেলে।

বেশি মাত্রার রেজ্যুলেশনের সিগন্যাল পেতে বিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের গ্রে মেটারে সরাসরি ইলেকট্রোড সংযোজন করতে পারেন। অথবা এই ইলেকট্রোড সংযোজন চলতে পারে মাথার খুলির নিচে মগজের উপরিভাগে। এর ফলে আরো বেশি করে ইলেকট্রিক সিগন্যাল সরাসরি পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে মগজের সুনির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ইলেকট্রোড স্থাপন করা যায়। আর তখন মস্তিষ্কের এসব এলাকায় সৃষ্টি করা হয় যথাযথ সিগন্যাল। তা সত্ত্বেও এই পদক্ষেপের রয়েছে নানা সমস্যা। এক্ষেত্রে ইলেকট্রোড সংযোজনের জন্য প্রয়োজন হয় ইনভেসিভ সার্জারির। আর দীর্ঘমেয়াদে ডিভাইস মগজে রেখে দেয়ার ফলে মস্তিষ্কের গ্রে মেটারের মধ্যে ক্রটিযুক্ত টিস্যু জন্ম নেয়। এই ক্রটিযুক্ত টিস্যু শেষ পর্যন্ত সিগন্যাল আটকে দেয়।

ইলেকট্রোডের স্থান যাই হোক, বেসিক মেকানিজম একই : ইলেকট্রোডগুলো নিউরনের পার্থক্য পরিমাপ করে। সিগন্যালকে তখন বিবর্ধিত ও ছাকা হয়। বর্তমান বিসিআই সিস্টেমে এই সিগন্যাল তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমপিউটারে ইন্টারপ্রিট করা হয়। আপনার হয়তো পরিচয় থাকতে পারে পুরনো অ্যানালগ এনসেফেলোগ্রাফের সাথে, যা সিগন্যাল ডিসপ্লে করত কলমের মাধ্যমে। এই কলম স্বয়ংক্রিয়ভাবে অব্যাহতভাবে একটি কাগজের ওপর প্যাটার্ন লিখে দিত। সেন্সরি ইনপুট বিসিআইয়ের ক্ষেত্রে ফাংশন চলে উল্টোভাবে। একটি কমপিউটার একটি সিগন্যাল কনভার্ট করে। এই সিগন্যালগুলো মস্তিষ্কের যথাযথ এলাকায় ইমপ্ল্যান্ট করা ইলেকট্রোড। আর সবকিছু ঠিকমতো কাজ করলে নিউরন ট্রিগার চেপে ফায়ার করলে বস্তু একটি দর্শনযোগ্য ছবির আকার নেয়। ক্যামেরা তা ধরতে পারে। মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ড পরিমাপ করার আরেকটি উপায় হচ্ছে 'ম্যাগনেটিক রেসোন্যান্স ইমেজ' তথা এমআরআই করা। একটি এমআরআই মেশিন খুবই ব্যাপক ও জটিল। এটি মস্তিষ্কের কর্মকাণ্ডের খুবই হাই রেজ্যুলেশনের ইমেজ তৈরি করে। কিন্তু এই ইমেজ স্থায়ী কিংবা অর্ধস্থায়ী বিসিআইয়ের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না। গবেষকেরা এটি ব্যবহার করেন সুনির্দিষ্ট ব্রেন ফাংশন মূল্যায়ন করার জন্য অথবা সুনির্দিষ্ট ব্রেন ফাংশনের জন্য ইলেকট্রোড কোথায় স্থাপন করতে হবে তার মানচিত্র তৈরির জন্যও তা ব্যবহার করা হয়। যেমন– যদি গবেষকেরা চান এমন ইলেকট্রোড স্থাপন করতে, যা তাদের সক্ষম করে তুলবে ভাবনা-চিন্তার মাধ্যমে রোবটের বাহু ব্যবহার করতে, তবে তাদেরকে প্রথমেই যেতে হবে এমআরআইয়ে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবে অথবা তাদের সত্যিকারের বাহু নড়াচড়া করার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে চাইবে। তখন এমআরআই প্রদর্শন করবে ব্রেনের কোন এলাকাটি সক্রিয় হয় বাহু নড়াচড়ার সময়। এর ফলে গবেষকেরা ইলেকট্রোড স্থাপনের লক্ষিত স্থান নির্ধারণ করতে পারেন।

কর্টিক্যাল প্লাস্টিসিটি : বছরের পর বছর ধরে একটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মস্তিষ্ককে বিবেচনা করা হয়েছে একটি স্ট্যাটিক অরগ্যান বা স্থিতিশীল অঙ্গ হিসেবে। আপনি যখন বেড়ে উঠতে থাকেন, একজন শিশু হিসেবে শেখার প্রক্রিয়ায় থাকেন, তখন আপনার মস্তিষ্ক নিজে নিজে আকার নিতে থাকে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে এবং এক সময় মস্তিষ্ক একটি অপরিবর্তনীয় রূপ নেয়।

১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে গবেষণা থেকে জানা যায়, বুড়ো বয়সেও প্রকৃতপক্ষে মানব মস্তিষ্ক নমনীয় থাকে। এই ধারণাই Cortical Plasticity নামে পরিচিত। এর অর্থ হচ্ছে মস্তিষ্ক নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার চমৎকার-চমৎকার উপায়ের অধিকারী। নতুন কিছু শেখা, নিউরনগুলোর মধ্যে নতুন নতুন ধরনের সংযোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে বয়স-সম্পর্কিত নানা নিউরোলজিক্যাল সমস্যা সৃষ্টি কমিয়ে রাখে। কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ যদি মস্তিষ্কে আঘাত পায়, তবে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশের কাজ সারতে পারে। ব্রেন কমপিউটার ইন্টারফেস প্রযুক্তির কেনো এত গুরুত্বপূর্ণ? এটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এর অর্থ হচ্ছে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই বিসিআই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে শেখার কাজ সারতে পারে। এর মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্কে নতুন সংযোগ গড়ে তুলে নিউরনের ব্যবহার করা যায় নতুনভাবে। যেখানে মস্তিষ্কে বিসিআই প্রযুক্তি সংযুক্ত হয়, সেখানে সে পরিস্থিতিতে এই সংযোজন প্রাকৃতিক মস্তিষ্কের অংশ হয়ে ওঠে।

বিসিআই অ্যাপ্লিকেশন : বিসিআই গবেষণার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে– এমন ডিভাইস তৈরি করা, যা মানুষের ভাবনা-চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই প্রযুক্তির কিছু কিছু প্রয়োগকে মনে হবে যেনো তুচ্ছ। যেমন, ভাবনা-চিন্তা দিয়ে ভিডিও গেম নিয়ন্ত্রণ করা। যদি আপনি মনে করেন রিমোট কন্ট্রোল সুবিধাজনক, তাহলে চিন্তা করা ▸

মাত্র চ্যানেল পাল্টে দিতে পারবেন। তবে এর আরো বড় প্রয়োগ ক্ষেত্র রয়েছে– এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন সব ডিভাইস তৈরি সম্ভব, যা ব্যবহার করে একজন পঙ্গু মানুষ স্বাধীনভাবে অন্যের সাহায্যে কাজকর্ম চালাতে পারবে, চলাফেরা করতে পারবে। আমাদের মধ্যে এমন অনেক প্যারালাইসিস রোগী আছেন যাদের দুই হাত ও দুই পা-ই অবশ হয়ে গেছে। কোনো হাত কিংবা কোনো পা-ই আর তার কাজে আসছে না। এদের বলা হয় কোয়াড্রিপ্লেজিক। এই কোয়াড্রিপ্লেজিক রোগীরা কমপিউটারে চিন্তা ব্যবহার করে কার্সরের মাধ্যম কমান্ড দিয়ে তাদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারবে। বদলে দিতে পারবে তাদের জীবনমান। কিন্তু এই ভোল্টেজ মেজারমেন্টকে আমরা কী করে একটি রোবট বাহু পরিচালনায় কাজে লাগাতে পারি? আগেকার গবেষণায় বানর ব্যবহার করা হয়েছে সংযোজিত ইলেকট্রোডের সাহায্যে। বানরগুলো রোবট বাহু নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করেছে জয়স্টিক। বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করেছিলেন ইলেকট্রোড থেকে আসা সিগন্যাল। শেষ পর্যন্ত এরা এভাবে নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন করেন, যাতে করে রোবটিক আর্ম নিয়ন্ত্রণ করা হয় ইলেকট্রোড থেকে আসা সিগন্যালের মাধ্যমে, জয়স্টিক দিয়ে নয়।

এরচেয়ে আরো কঠিন একটি কাজ হলো, যারা দৈহিকভাবে নিজেদের হাত নড়াচড়া করতে পারেন না, তাদের চলাফেরার জন্য মস্তিষ্কের সিগন্যালের ব্যাখা-বিশ্লেষণ করা। এ ধরনের কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে ডিভাইস ব্যবহার সম্পর্কে। একটি ইইজি তথা electroencephalograph-এর সাহায্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সবকিছুই ছবির মতো মনে আনতে পারবে। সফটওয়্যার জেনে নিতে পারবে মন থেকে আসা চিন্তা-ভাবনার যাবতীয় সিগন্যাল। রোবট বাহুর সাথে সংযুক্ত সফটওয়্যার এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে, যাতে করে 'ক্লোজ হ্যান্ড' সিগন্যাল গ্রহণ করে ওই সিগন্যাল রোবটিক আর্মে পাঠাতে পারে। একই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় কার্সর ম্যানেজমেন্টের কাজে। এই কার্সর ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার চিন্তার সাথে কার্সর সামনে, পেছনে, ডানে কিংবা বামে নিতে পারবে। পর্যাপ্ত অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যবহারকারী কার্সরের ওপর এমন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে যে, সে এর সাহায্যে বৃত্ত আঁকতে পারবে, কমপিউটার প্রোগ্রামে ঢুকে পড়তে পারবে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে টেলিভিশন। তাত্ত্বিকভাবে বলা যায়, এর মানুষ চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে হাত ব্যবহার না করে টাইপও করতে পারবে।

একবার যদি চিন্তাকে কমপিউটারায়িত কিংবা রোবটিক অ্যাকশনে পরিণত করার মেকানিজমকে পরিপূর্ণতা দেয়া যায়, তবে এই বিসিআই প্রযুক্তির সম্ভাবনা হবে সীমাহীন। রোবট বাহুর পরিবর্তে পঙ্গু ব্যক্তির শরীরের কোনো অঙ্গে লাগানো থাকবে রোবট বালা বা চুড়ি। এর ফলে এরা সুযোগ পাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী যাবতীয় কাজ সারতে। এমনকি তখন ডিভাইসে রোবট অংশের কোনো প্রয়োজনই অবশেষ থাকবে না। হাতে থাকা যথাযথ মোটর নিয়ন্ত্রিত নার্ভই চালাবে সবকিছু। পঙ্গুরা পাবে নতুন জীবন।

সেন্সরি ইনপুট : একটি ব্রেন কমপিউটার ইন্টারফেস (বিসিআই) ব্যবহার সবচেয়ে পুরনো ও সাধারণ ব্যবহার হচ্ছে একটি cochlear implant। একজন গড়পড়তা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে শব্দতরঙ্গ কানে প্রবেশ করে বেশ কয়েকটি ছোট অঙ্গ দিয়ে চলে যাওয়ার পর শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রিক সিগন্যালের আকারে অডিটরি নার্ভে

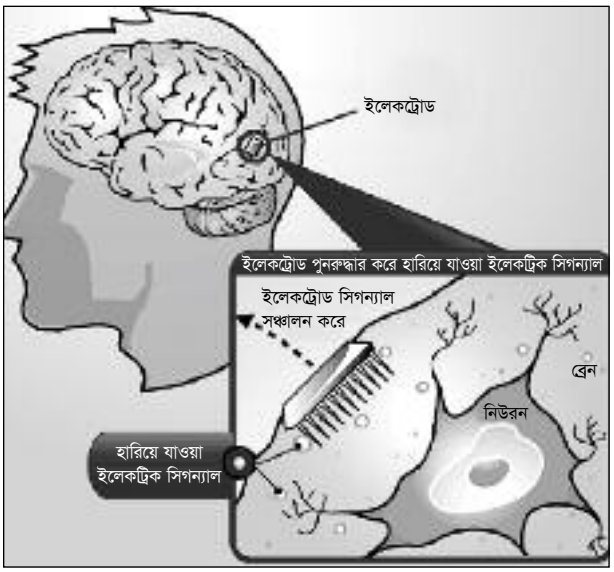

যেভাবে কাজ করে ব্রেন কমপিউটার ইন্টারফেস

কম্পন সৃষ্টি করে। কানের মেকানিজম যদি ব্যাপকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তখন মানুষ কানে শুনতে পারবে না। তা সত্ত্বেও অডিটরি নাম ভালোভাবেই কার্যকর থাকে। এগুলো শুধু কোনো সিগন্যাল পায় না বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কানে শুনতে পায় না। একটি cochlear implant কানের অকার্যকর অংশ বাইপাস করে সাউন্ড ওয়েভ বা শব্দতরঙ্গকে ইলেকট্রিক সিগন্যালে প্রসেস করে ইলেকট্রোডের মাধ্যমে তা ঠিক পৌঁছে দেয় অডিটরি নার্ভে। এর ফলে একজন বধির মানুষও কানে শুনতে পায়। হতে পারে সে একদম পুরোপুরি শুনতে পারে না। তবে মানুষের কথাবার্তা শুনতে ও বুঝতে পারবে।

মস্তিষ্কের ভিজ্যুয়াল ইনফরমেশন থেকে কিন্তু অডিও ইনফরমেশন আরো বেশি জটিল। সে কারণে কৃত্রিম চোখ লাগানো কাজটা ততটা এগিয়ে যেতে পারেনি। যদিও উভয় ক্ষেত্রে তত্ত্ব ও নীতি-প্রকৃতি একই। ইলেকট্রোডগুলো লাগানো ভিজ্যুয়াল করটেক্সের ভেতরে বা কাজে স্থাপন বা সংযোজন করা হয়। ভিজ্যুয়াল করটেক্স হচ্ছে মস্তিষ্কের সেই এলাকা, যা রেটিনা থেকে পাওয়া ভিজ্যুয়াল ইনফরমেশন প্রসেস করে। ছোট্ট ক্যামেরা লাগানো একজোড়া চশমা কমপিউটার ও সংযোজিত ইলেকট্রোডের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

প্রশিক্ষণ সময়ের পর রিমোট থট-কন্ট্রোলড মুভমেন্টের মতোই দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষ দেখতে পারে। আবারো বলা দরকার, এই দৃষ্টি পরিপূর্ণ নয়। তবে প্রযুক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে দৃষ্টিমান ব্যাপক উন্নত করা সম্ভব হয়েছে। এ পদক্ষেপের সূচনা করা হয়েছিল ১৯৭০-এর দশকে। জেনস নার্ভম্যান নামে এক ব্যক্তি ছিলেন দ্বিতীয় প্রজন্মের ইমপ্ল্যান্টের রেসিপিয়েন্ট। তিনি ছিলেন পুরোপুরি অন্ধ। কিন্তু এখন তিনি নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারেন নিজে নিজে, কারো সাহায্য ছাড়াই। এমনকি পার্কিং লটের চারপাশে গাড়ি পর্যন্ত চালাতে পারেন। এক সময়ে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর এ বিষয়টি এখন পুরোপুরি বাস্তব জগতে। নিউম্যানের মস্তিষ্কে যে টার্মিনাল সংযুক্ত করেছে ক্যামেরার গ্লাসগুলোকে ইলেকট্রোডের সাথে, তা একই ধরনের স্টার স্ট্রেকের অন্ধ প্রকৌশলী কর্মকর্তা গিয়র্ডি লা ফর্জের পরা চশমা VISOR (Visual Instrument and Secondary Organ)-এর মতো। তা সত্ত্বেও নিউম্যান ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের অদৃশ্য অংশ দেখতে পান না।

থট কন্ট্রোল : আমরা যদি কারো মস্তিষ্কে সেন্সরি সিগন্যাল পাঠাতে পারি, এর অর্থ কি এই নয় যে এই থট কন্ট্রোল আমাদের শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে? কেউ বলছেন, সম্ভবত নয়। তুলনামূলক একটি সেন্সরি সিগন্যাল মস্তিষ্কে পাঠানো অনেক জটিল এক কাজ। কারো মস্তিষ্কের সেন্সরি সিগন্যাল পাঠিয়ে কাউকে দিয়ে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেকোনো কাজ করিয়ে নেয়ার প্রযুক্তি এখনো অনেক দূরে। তাছাড়া আগে থট কন্ট্রোলারদের প্রয়োজন হবে আপনাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে আপনার মস্তিষ্কে ব্যাপক সার্জারির মাধ্যমে ইলেকট্রোড সংযোজন করা।

বিসিআই প্রযুক্তির পেছনে কাজ করা মূল নীতিটা এখন আমরা জানি ও বুঝি। তবুও বাস্তবতা হচ্ছে এই প্রযুক্তি এখনো পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে পারছি না। এর পেছনে রয়েছে নানা কারণ। মানব মস্তিষ্ক অবিশ্বাস্য ধরনের জটিল। বলা দরকার, মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও কর্মকাণ্ড মানুষের মস্তিষ্কে কাজ করা ইলেকট্রিক সিগন্যালেরই ফল। আর এই ইলেকট্রিক সিগন্যাল কম জটিল নয়। মানব মস্তিষ্কে রয়েছে ১০ হাজার কোটি নিউরন। জটিল ওয়েব কানেকশনের মাধ্যমে প্রতিটি নিউরন গ্রহণ করছে ও পাঠাচ্ছে নানা ধরনের ইলেকট্রিক সিগন্যাল। এর সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে রাসায়নিক প্রক্রিয়াও, যা ইইজি নামের যন্ত্র এখনো ধরতে পারে না।

এই সিগন্যালগুলো দুর্বল এবং এগুলোকে মোকাবেলা করতে হয় নানা বাধা। ইইজি পরিমাপ করে ছোট পরিমাপের ভোল্টেজ পটেনশিয়াল। একজন মানুষের চোখের পলকের মতো ছোট কাজেও সৃষ্টি হয় বেশ শক্তিশালী সিগন্যাল। ইইজির আরো উন্নয়ন এবং সেই সাথে ইলেকট্রোজ সংযোজনেরও উন্নতি বিধানের মাধ্যমে এক্ষেত্রে বিদ্যমান অনেক সমস্যাই সম্ভব কাটিয়ে ওঠা যাবে। তবে এখনো তা সম্ভব হয়নি। মস্তিষ্কের সিগন্যাল পাঠ করার বিষয়টি এখন অনেক ব্যাড ফোন কানেকশন শোনার মতোই– কখনো বোঝা যায়, আর কখনো যায় না। এখনো পুরো প্রযুক্তিটা অনেকটা নিশ্চল। যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম খুব কমই বহনযোগ্য। এটি ব্যবহার ▶

না করাই বরং সর্বোত্তম। প্রথম বিসিআই প্রযুক্তি ব্যবস্থার হার্ডওয়্যার পুরা হয় একটি ব্যাপকধর্মী মেইনফ্রেম কমপিউটারে। এখনো অনেক বিসিআইয়ের প্রয়োজন হয় যন্ত্রপাতির সাথে তার সংযোগের। আর যেগুলো তারবিহীন সেগুলোর সাথে বহন করে নিয়ে যেতে হয় এমন একটি কমপিউটার যার ওজন ১০ পাউন্ড। তবে অন্যান্য প্রযুক্তির মতোই এই প্রযুক্তিপণ্যও আসছে দিনে ক্রমেই হালকা থেকে হালকাতর হবে।

বিসিআই উদ্ভাবক : বিসিআইয়ের ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি কোম্পানি অগ্রদূতের ভূমিকা পালন করেছে। তবে এগুলোর বেশিরভাগই গবেষণা পর্যায়ে। তবে কিছু কিছু বিসিআই বাণিজ্যিক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। 'নিউরাল সিগন্যালস' একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে, যার সাহায্যে বাকপ্রতিবন্ধীদের কথা বলার ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। মগজের যে এলাকাটি কথা সঞ্চালন করার কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট, তার নাম Borca's area। মগজের এই এলাকায় ইলেকট্রোড সংযোজন করে সিগন্যাল কমপিউটারে পাঠিয়ে তা পরে বক্তার কাছে পাঠানো যাবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইংরেজি ভাষার ৩৯টি ফেনিমসের সবগুলো সম্পর্কে ভাবতে শিখবে এবং মাধ্যমে বক্তব্য পুনর্গঠন করতে পারবে একটি কমপিউটার ও স্পিকারের সাহায্যে।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা 'নাসা' একই ধরনের একটি সিস্টেম নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এ সিস্টেমে সরাসরি মগজ থেকে ইলেকট্রিক সিগন্যাল পাঠ না করে, এর বদলে তা পাঠ করে মুখ ও জিহ্বা থেকে। সম্প্রতি নাসার গবেষকেরা মানসিকভাবে NASA শব্দটি টাইপ করে গুগলে ওয়েবসার্চ করতে সক্ষম হয়েছেন। 'নিউ সায়েন্টিস্ট' নামের বিজ্ঞান সাময়িকী সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছে।

'সাইবারনেটিকস নিউরোটেকনোলজি সিস্টেমস' তৈরি করছে BrainGate, যা আসলে একটি নিউরাল ইন্টারফেস সিস্টেম। এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধীরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন তাদের হুইল চেয়ার, রোবটিক প্রসথেসিস কিংবা কমপিউটার কার্সর। জাপানের গবেষকেরা উদ্ভাবন করেছেন একটি প্রাথমিক বিসিআই।

বিসিআইয়ের আগামী দিন

এই বিসিআই প্রযুক্তির মাধ্যমে শিগগিরই হয়তো আমরা আমাদের চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারব। এরই মধ্যে আপনি-আমি বেসিক কনভারসেশন করতে শুরু করেছি আমাদের স্মার্টফোন, ডেস্কটপ পিসি, গেম কন্সোল, টিভির সাথে। আর শিগগিরই তা করতে পারব গাড়ির সাথে। কিন্তু এ ধরনের ভয়েস রিকগনিশন এখনো থেকে গেছে বিজ্ঞানী সমাজের একটি ফোল্ডার মার্কেট 'ডাম্ব' টেকনোলজিতে। ইলেকট্রনিক ভোক্তাপণ্যে নিয়ন্ত্রণের নতুন নতুন উপায় আসছে। শিগগিরই কথা বলে, কিংবা অঙ্গ দুলিয়ে কমপিউটার অপারেট করার পরিবর্তে তা করব শুধু 'চিন্তা'র মাধ্যমে। বিসিআই এমএমআই (মেইন্ড-মেশিন ইন্টারফেস) নামেও পরিচিত। এর ওপর গবেষণা এতদূর এগিয়ে গেছে যে, এটি এখন প্রস্তুত মানুষ ও যন্ত্রের মধ্যে পুরোপুরি নতুন এক সিম্বায়োটিক সম্পর্ক তৈরির জন্য। এটি এমন এক পর্যায়ে আমাদের পৌঁছাতে পারে, যে 'স্পিচ' বিবেচিত হবে অপ্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে। তখন মানুষ তারবিহীনভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে ইউনিভার্সেল ট্র্যানস্লেটর চিপের মাধ্যমে। তখন নাইট ক্লাবগুলোর লাউড মিউজিক নিয়ে কোনো অভিযোগের কথা শোনা যাবে না। মানুষ ভুলে যাবে ওয়্যারলেস রেভ্যুলেশনের কথা। বৈপ্লবিক প্রাযুক্তিক ক্যাবল ডিমান্ডের কথা। ব্রিটিশ টেলিকমিউনিকেশনের সাবেক সিটিও ও বর্তমান দিনের স্বাধীন বিশ্লেষক পিটার কক্রেন বলেন, 'ব্রেন কমপিউটার ইন্টারফেসে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মানবদেহে ইলেকট্রনিক কানেকশনের মাধ্যমে একটি কমপিউটারের ওপর যেকোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ। এই কানেকশন হতে পারে যেকোনো ধরনের নার্ভ সিগন্যাল বা ইমপালস, যা আসে মানবদেহের উপরিভাগ থেকে। এটি হতে পারে মাথা কিংবা দেহের অন্য কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অথবা মাসল-ইমপালস ধরে আনা যেতে পারে বাহু, হাত, মুখ বা কপালের ইলেকট্রোড দিয়ে। শরীরের নড়াচড়ার মাধ্যমে এই মাসল-ইমপালসের সৃষ্টি হয়। একজন ব্যক্তির সত্যিকার শরীর নড়াচড়ার মাধ্যমে ব্যক্তি ও কমপিউটারের মধ্যে একটি লিঙ্ক সৃষ্টির পরিবর্তে বিসিআই ব্যবহার করতে পারে একটি এমআরআই স্ক্যানার অথবা মানুষের ব্রেনের সাথে সরাসরি ইলেকটিক্যাল কানেকশন।

মাইন্ড কন্ট্রোল : এরই মধ্যে যদি আপনি মাইন্ড কন্ট্রোল তথা মন নিয়ন্ত্রণের কথা ভেবে থাকেন, তবে খুব একটা ভুল করবেন না। 'অ্যাভাটার' নামের ছায়াছবিতে মানুষ দূর থেকে জেনেটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্ড একটি অ্যালিয়নকে পরিচালনা করতে দেখা গেছে। আপনি সম্ভবত এর কাছাকাছি একটা কিছু ভেবেছেন। অটোমেটিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এবং সত্যিকারের সেন্টিয়েন্ট মেশিনের মধ্যকার পার্থক্য ঘোচাতে বিকাশমান রোবট শিল্পখাত একটি পণ্য নিয়ে এগিয়ে এসেছে। এই প্রটোটাইপ TELESVAR V-এর সাহায্যে একজন হিউম্যান অপারেটর কমপ্লেক্স সার্জারি সম্পন্ন করতে পারবে। চাঁদেও এটি ব্যবহার করা যাবে।

প্যারালাইজড মানুষদের জন্য বহু উপকারী হবে বিসিআই। বিশেষ করে লকড-ইন-সাফারার এবং রাইট-টু-ডাই আন্দোলনের প্রবক্তা টনি নিকলিনসনের মতো লোকদের জন্য বিসিআই হবে এক অনন্য উপহার। উল্লেখ্য, টনি নিকলিনসন মারা গেছেন গত আগস্টে। এদের ক্ষেত্রে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়ার কোনো প্রয়োজন হবে না। শুধু 'মন' ব্যবহার করেই এরা কাজ করতে পারবেন।

জাপানের কিও ইউনিভার্সিটি এবং টোকিও ইউনিভার্সিটি উদ্ভাবিত রোবট ব্যবহারকারীরা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পারেন। বিষাক্ত রাসায়নিক দূর থেকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ও পারমাণবিক দুর্ঘটনা তদন্তে বিসিআইয়ের ব্যবহার হবে অন্তহীন।

ক্লেয়ার কারমাইকেল নামের ই-এক্সেসিবিলিটি বিষয়ক এক বিশ্লেষক কাজ করছেন একটি বিসিআই প্রটোটাইপের ওপর। এর নাম BraenAble। এটি উদ্ভাবন করা হয়েছে ব্যাপকভাবে পঙ্গু হয়ে যারা লকড-ইন-সিনড্রোম অবস্থায় রয়েছে তাদের জন্য।

বিসিআই পণ্য এরই মধ্যে বাজারে কেনাবেচা হচ্ছে। এমিটড সিস্টেমস গেমারদের কাছে বিক্রি করছে এর EPOC নিউরো হ্যান্ডসেট। এটি ইলেকট্রনিক সিগন্যাল পাঠ করে পরিধানকারীর মগজের, যাতে করে সুনির্দিষ্ট কোনো গেম অপারেট করার জন্য। এরই মধ্যে অস্ট্রিয়ান মেডিক্যাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি g.tec বিক্রি করছে P300 Speller, interndex, যা প্রতিবন্ধী মানুষ ব্যবহার করছে ব্রেন পেইন্টিংয়ের কাজে। কারমাইকেল বলেছেন, প্রযুক্তির জগতে বিসিআইয়ের রয়েছে জোরালো সম্ভাবনা।

হিউম্যান ব্রেন হ্যাকিং নয়া যুদ্ধক্ষেত্র

আমরা এ পর্যন্ত নানা যুদ্ধক্ষেত্র প্রত্যক্ষ করেছি। প্রথম যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে ল্যান্ড বা ভূমি। দ্বিতীয় যুদ্ধক্ষেত্র সমুদ্র। তৃতীয় যুদ্ধক্ষেত্র আকাশ বা এয়ার। চতুর্থ যুদ্ধক্ষেত্র মহাকাশ বা স্পেস। পঞ্চম যুদ্ধক্ষেত্র সাইবারস্পেস। এরপর কী? নতুন যুদ্ধক্ষেত্র হচ্ছে হিউম্যান ব্রেন হ্যাকিং। এ যুদ্ধের সার কথা হচ্ছে মানুষের মগজে দূর থেকে কমপিউটারের সাহায্যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিয়ে নেয়া। সোজা কথায় অন্য মানুষের মগজের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিপক্ষের মানুষের ওপর এভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে কার্যত প্রতিপক্ষকে পদানত করা। আর এক্ষেত্রে হাতের কাছের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে বিসিআই টেকনোলজি। বিসিআই টেকনোলজির কাছ হচ্ছে মানব মগজ ও ডিভাইসের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে দেয়া। মানবদেহে বিসিআই প্রয়োগের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দেখা গেছে– এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্রেন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কোয়াডকপ্টার ড্রোন ও মেটাল এক্সোস্কেলেটন। হয়তো শিগগিরই আমরা পাব মাইন্ড কন্ট্রোলড ওয়েপোনাইজড ড্রোন। কিংবা বিসিআই প্রযুক্তিকে কাজে লাগাব সৈনিকদের ক্ষমতা, দক্ষতা ও নৃশংসতা বাড়াবে।

যুক্তরাষ্ট্র সশস্ত্র বাহিনীর সাময়িক গবেষণা প্রতিষ্ঠান DARPA কোটি কোটি ডলার খরচ করছে জটিল নিউরোসায়েন্সকে বোঝার জন্য, যাতে করে তা ব্যবহার করা যায় সামরিক ক্ষেত্রে।

তবে সবচেয়ে দুঃখজনক হবে, যদি বিসিআই প্রযুক্তি ব্যবহার প্রতিপক্ষের লোকদের ব্রেন হ্যাকিং করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে লাগালে। এটি নৈতিক দিক থেকে কখনই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। এমনটি শুরু হলে মানবজাতি বিপর্যয়ের মধ্যে পড়বে।

শেষ কথা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভাবকেরা কাজ করেছেন বৈজ্ঞানিক ও প্রাযুক্তিক জ্ঞানকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু মানবতার শত্রুতা সে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নানা সময়ে ব্যবহার করেছে মানুষের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে। বিসিআই প্রযুক্তিকে যেখানে মানুষের কল্যাণে ব্যবহারের সমূহ সুযোগ রয়েছে, সেখানে ব্রেন হ্যাকিং করার মতো কাজে ব্যবহার করে এর অপব্যবহারের প্রকোপটাও থেমে নেই। বিশেষ করে DARPA সেদিকেই বেশি মনোযোগী। বিশ্বের মানুষের সবল দাবি– বন্ধ হোক এই অপপ্রয়াস। বিসিআই প্রযুক্তির পুরো সুযোগটাই কাজে লাগানো হোক মানবকল্যাণের পেছনে কজ